Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 454 – 462
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

'ধানুয়া টোটোর কথামালা' : টোটো জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতির দর্পণ

মেঘা ভট্টাচার্য
বি.এড. শিক্ষার্থী
এন.বি.এস. কলেজ অব এডুকেশন, জলপাইগুড়ি
Email ID : meghabhattacharjee169@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
lifestyle of the Totos,life struggle, food habit, connection with nature, Folklore, Puja-Parvan, Toto words, Degradation of Language & tradition.

Abstract
'Dhanua Toto's Kothamala written by Padma Shri awardeed Dhaniram Toto, in this novel, the life struggle of the Toto people is described in various ways, their ancient customs, puja parbans, use of words etc. 'Toto' is a small Indian community living in the northern tip of West Bengal's Alipurduar district on the border in Bhutan. Set in the background of 1972, the main character of this novel is 'Dhanua'. The way in which Toto's lifestyle, culture, tradition or language has come into context is indicated in the beginning as analyzed in the discussion article.

- The main livelihood of the Toto people is agriculture, they also collect vegetables and fruits from the forest. In this source, the picture of close association between forest and Toto can be seen.
- Lankapara forest, Doamara cave, fountains etc. are two places involved in the daily life flow of Totojanjati. The memories of many generations associated with this place are discussed in the article.
- A common folktale among the Toto people mentions the curse given by the Rava people. 'Sengja' God, 'Bibarou Pujo', and Hispa and Pudua hills are described as the deities worshiped by the Totos.
- The stories of the ancestors of the Totos as told through the mouths of the storytellers, such as folklore documents, also shed light on the hunting practices of the ancestors of the Totos.
- The reader is introduced to several Toto words in this novel, their meaning is discussed in the article.

A language, heritage captures the nation's existence. Dhanua expressed anger that the preservation of Toto's ancient heritage, language is not seen among the descendants. The article sheds light on

this issue. Social degradation and politics are discussed in the novel. When a political party tries to fulfill its mission by calling on promises, Dhanua protests to save 'Aranya'. Worshiping once in the name of 'Sengja' is not only the religion of the Totos. Saving the forest in the name of forest god 'Sengja' is the real religion. Did Dhanua run away by setting fire to the Bit Office and the forest bungalow as a protest against those who were involved in the sacrifice of destroying nature? The answer is not found in the novel. 'Dhanua' only leaves the impression of his existence on the heart of the reader. 'Dhanua Toto's Kothamala' became an extraordinary mirror of Toto society, their gods, folklore, happiness & sorrow.

Discussion

এক

> "যতই পয়সা রোজগার কর, যত টাকা জমিয়েই পাহাড় কর, যতই পাকা বাড়ি কর, যতই না গাড়ি হাঁকাও তোমার ইতিহাস যদি তুমি ভুলে যাও জগৎ দরবারে তুমি ভিখারীই থাকবে।"[১]

মানব সভ্যতার উন্নতির বীজ লুকিয়ে আছে তার অতীত ইতিহাসে। ইতিহাস অধ্যয়ন না করলে ভবিষ্যতের ভূমির অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হয় না। ফাটল তৈরি হয় সভ্যতার শিরায় শিরায়। আর সে কারণেই ইতিহাসকে সাথে নিয়ে বর্তমানকে সঙ্গী করে পাড়ি দিতে হয় ভবিষ্যতে, আর নিজের শিকড়কে আঁকড়ে ধরে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার এই বার্তা পাই ধনীরাম টোটো রচিত 'ধানুয়া টোটোর কথামালা' এই উপন্যাসে। 'পদ্মশ্রী' - পুরস্কার বিজয়ী ঔপন্যাসিকের এই উপন্যাস সাক্ষ্য বহন করেছে উত্তরবঙ্গের এক ক্ষুদ্র জনজাতির জীবন সংগ্রামের। Wikipedia - এর তথ্যানুসারে 'টোটো' ভারতের এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর প্রান্তে ভুটান সীমান্তে তাঁদের বাস। জনশ্রুতি অনুযায়ী ১৮৬৫ এর ইঙ্গ ভুটান যুদ্ধে ইংরেজদের হয়ে তারা টোটা বহন করেছিলেন বলেই তাঁদের নাম টোটো।[২] এছাড়াও প্রখ্যাত লেখক বিমলেন্দু মজুমদার প্রদত্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় টোটো জনজাতি মঙ্গল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[৩] লেখক ধনীরাম টোটো ১৯৬৪ সালে টোটোপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিশুকাল থেকেই টোটো ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা নিয়েই বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের মূল চরিত্র ধানুয়া টোটোর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লেখক অনায়াস দক্ষতায় আমাদের সাথে পরিচয় করিয়েছেন টোটো জনজাতির জীবন যাত্রা, লোককথা, পূজা-পার্বণ প্রসঙ্গ ইত্যাদির সাথে। এভাবেই ইতিহাস, পুরাকথা, প্রকৃতিকে তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসে এঁকেছেন। সামাজিক অবক্ষয় ও টোটোদের সুখ-দুঃখে মোড়া জীবনকথার অসামান্য সুবর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে 'ধানুয়া টোটোর কথামালা'।

দুই

'ধানুয়া টোটোর কথামালা' উপন্যাসে রয়েছে উনিশটি পরিচ্ছেদ। উপন্যাসটি ১৯৭২ সালের পটভূমিতে রচিত। এ উপন্যাস সমৃদ্ধ হয়েছে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণে ও টোটো পাড়ার আঞ্চলিক বিবরণীতে। যার ফলে খুব সহজেই উপন্যাসের শুরু থেকেই একাত্ম হয়ে যেতে হয় টোটোপাড়ার সাথে। শিশু ধানুয়ার মাদারিহাটের হাট দেখতে যাওয়ার আগ্রহের মধ্যদিয়ে উপন্যাস শুরু হয়। টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাট এর পথ বর্ণনায় টোটোপাড়ার ভৌগলিক অবস্থান এই ভাবে পরিস্ফুট হয় -

> "টোটোপাড়া থেকে মাদারী হাটের পথ ২৩ কিলোমিটার বন জঙ্গল পেরিয়ে, একের পর এক নদী খাত পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে। পথে অবশ্য কয়েকটা পাড়া পড়ে। প্রথমে হল্লাপাড়া-বরালি ভগত জোত। তারপর তিতি নদী পেরিয়ে হানটা পাড়া।"[৪]

উপন্যাসের শুরুতেই বিপুল আকৃতি রেলগাড়ি দর্শনে ধানুয়ার আনন্দের দৃশ্যে পথের পাঁচালীর অপুর কথা মনে পড়ে যায় -

> "সব কল্পনাকে হার মানায় এমন বিশাল এক ভোতা মুখো লোহার সাপ যেন বীভৎস গর্জন করতে করতে তীর বেগে ছুটে আসছে।"[৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 454-462
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেশ-কালের গণ্ডী এক করে শিশু মন বোধহয় এভাবেই বিস্ময়ের উন্মাদনায় মুগ্ধ হতে চায় বারবার। ধানুয়ার দিদিমা সুনকরী টোটো, বাবা আমেপা টোটো, মা-লক্ষ্মীনি টোটো; তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন পাহাড়ের ঢালে মকাই চাষ করে। এছাড়াও লঙ্কাপাড়ার জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ, সবজি, ফলমূল সংগ্রহ করে থাকেন। তাঁরা জীবন নির্বাহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। 'জঙ্গল সংগ্রহ' পরিচ্ছেদে দেখি প্রকৃতির সাথে তাদের নিবিড় মেলবন্ধনের চিত্র। দিদিমা, ধানুয়াকে বলে দেন 'চরুসাই' ও 'মুরুংসাই' লতা সংগ্রহ করে আনার জন্য যা দিয়ে তৈরি হবে ওষুধ। এছাড়াও, 'দুদরুমসাই', 'কেরংসাই' ইত্যাদি বনজ দ্রব্যের নাম জানতে পারি এই পর্বে। এভাবেই দেখা গেছে ধানুয়াও পরবর্তীতে দারচিনি বা রিঠা ফল সংগ্রহ করে নিয়ে এসে সংসার খরচ সংগ্রহ করেছে। 'চম্পাকলির প্রস্থান' পরিচ্ছেদে দেখা যায় দিতি নদীর তীরের জঙ্গলের পিপলা ফল সংগ্রহ করে তাকে শুকিয়ে মহাজনদের কাছে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছে। অর্থাৎ দেখাই গেল তাঁদের জীবিকা নির্বাহ এভাবে অধিকাংশই অরণ্য নির্ভর। তাদের খাদ্যাভাসে বারবার 'ইউ' এর উল্লেখ পাওয়া যায়, এই 'ইউ' হল জারানো মারুয়া নামক খাদ্যদ্রব্য। এছাড়াও যথাযথ নামের উল্লেখ না থাকলেও ধানুয়ার স্ত্রী চম্পাকলি এক ধরনের বনজ 'ছত্রাক' খেতে বেশ পছন্দ করত। এ ভাবেই ভাতের পাশাপাশি 'ইউ', ভুট্টা, দুদরুমসাই, কেরংসাই নামক লতা, এবং খাদ্যোপযোগী ছত্রাক গ্রহণের রীতির সন্ধান পাওয়া যায়। বাড়িতে পোষ্য হিসেবে ধানুয়া শুয়োর ও মুরগি পুষত। সহজেই অনুমেয় অধিকাংশ টোটো পরিবারে এ ধরনের পশুপালন করার রীতি প্রচলিত ছিল। ক্রমে উপন্যাস এগোয় টোটো দের দৈনন্দিন জীবনধারণ রীতির পাশাপাশি পরিচিতি হয় ডয়ামারা গুহার সাথে -

> "ছোট্ট এই গুহাটি প্রকৃতি তার আশ্চর্য খেয়ালে যে কি অপরূপ সাজিয়েছে। গুহার মেঝেটি পাথরের উপর পাথরের স্তরে যেন একটা বেদী তৈরি করেছে। আর গুহার ছাদটি উঁচু থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসে মিশেছে মেঝেতে। সেই ছাদ জুড়ে পাথর আকৃতি নিয়েছে সার সার গরুর বাটের মত, যার মুখ দিয়ে জল চুইয়ে আসে খুব ধীরে। ...টোটোদের কাছে এই ডয়ামারা গুহা একটি পবিত্র স্থান। ...এখানে এসে একান্তে বহু টোটো যুবক-যুবতী নিজেদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসার ফুল ফুটে উঠতে দেখেছে।"[৬]

এই ডয়ামারা গুহায় বসে থাকাকালীন ধানুয়ার জীবনেও এসেছিল নারী- চম্পাকলি। যার সাথে শুভ পরিণয়ের মাধ্যমে আগামী অতিবাহিত হয়েছিল। এভাবেই লেখক এর প্রাঞ্জল বর্ণনায় মুহূর্তেই মূর্ত হয়ে ওঠে লঙ্কাপাড়ার জঙ্গলের মধ্যে এই ডয়ামারা গুহাকে, যাতে জড়িয়ে আছে টোটো জনজাতির বহু প্রজন্মের স্মৃতি।

টোটোপাড়া একসময় সমৃদ্ধ ছিল কমলালেবুর গাছে। উপন্যাসে রয়েছে শতরিং, জিদিঙ, ডুকরং এলাকায় ব্যাপকভাবে কমলালেবুর চাষ হত। কিন্তু কালক্রমে এই কমলালেবু চাষ বন্ধ হয়ে যায়। এর পিছনে থাকা কারণ হিসাবে ধানুয়ার মা গল্প শোনায় রাভা জাতির অভিশাপের কথা, যা টোটো জনজাতির লোক-কথার ইতিহাসে কালের পরম্পরায় চলে এসেছে -

> "রাভা জাতিরা টোটোপাড়া এসেছিল তাদের নাচ প্রদর্শন করতে। কিন্তু টোটো জনজাতির মানুষরা বহিরাগত মানুষদের হইহল্লা উচ্চস্বরে কথা পছন্দ করত না। তাই তারা রাভা জাতির মানুষদের নাচ গান করা থেকে বিরত করে। রাভা জাতির মানুষেরা তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল যে টোটোদের অহংকারের মূল সব কমলালেবু গাছ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই অভিশাপই ফলেছে।"[৭]

এভাবেই উপন্যাসে ধরা পড়ে টোটোদের লোকবিশ্বাস। এই লোক কথার নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তৈরি নয় যুগ যুগ ধরে চলে আসা একটি জনজাতির বিশ্বাস. যা লেখক এর লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে সমৃদ্ধ করেছে উপন্যাসটিকে।

তিন

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতি যেমন আমাদের লালন করে, তেমনি রুষ্ট হলেও তার পরিণতি হবে মারাত্মক। এই বিশ্বাস থেকেই পূজিত হন লৌকিক দেবদেবী। বংশ পরম্পরায় চলে এই লৌকিক দেবতার পূজা-পার্বণ। পরিবার ও সমাজের শুভ ও কল্যাণবোধের কামনায় লৌকিক দেবদেবী পূজিত হন।[৮] লোককথায় রাভা প্রদত্ত অভিশাপের কাহিনী

প্রচলিত থাকলেও বাস্তবে রাভা বা মেচদের সাথে টোটোদের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। রাভাদের সাথে টোটোদের সু-সম্পর্ক থাকার কারণে পূজা পার্বণের বিষয়েও তাদের থেকে অনেক কিছুই শিখেছিল টোটোরা, যেমন- মাটি, নদী, ঝোরা পুজোর মন্ত্র, ও পায়রা পুজোর মন্ত্র ইত্যাদি –

> "বর্তমানেও টোটো জনজাতির মানুষরা তাদের নিজস্ব পুজো-পার্বণের পাশাপাশি এসব মন্ত্র পাঠ করে পুজো করে থাকে।"[৯]

যেসব রাভা পুরোহিত টোটো পাড়ায় পুজো করতে আসতেন তাদের আবার টোটোরা রাভা গ্রামে পৌঁছে দিয়েও আসতেন। অনেক সময় টোটোপাড়া থেকে বাইরে যাতায়াতের পথে তারা রাভা বস্তিতে থেকে যেতেন। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হত। বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ প্রাপ্ত দুটো পিতলের কড়াই রাখা ছিল টোটো দের কাছে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী টোটো সমাজে কারো বিয়ের সময় সেই কড়াই এর ব্যবহার করার চল রয়েছে। এক একটা কড়াইতে একশ জন খাবার মত মাংস রান্না করা যেতে পারে।

টোটো জনগোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন প্রকৃতি। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সন্তান তারা, প্রকৃতিকে দেখে ঈশ্বর সমান। তাঁরা বলে – এই প্রকৃতিই হল আমাদের ইশ্বর আমাদের 'সেংজা'। টোটোদের আরাধ্য দেবতা হিসাবে 'সেংজা'-র নাম উঠে এসেছে বারবার। যখনই দুঃসময়ে এসেছে 'সেংজা'র প্রসঙ্গও এসেছে। যেমন - বড় মাস্টার ধানুয়াকে পড়াশোনা না করার জন্য তিরস্কার করতেন। কিন্তু ধানুয়া যে তার ভাষা বুঝতো না এটা বোঝার মত দরদী মন মাস্টারের ছিল না। ফলতঃ মনে ব্যাথা নিয়ে যখন সে অশ্রুবর্ষণ করেছে তাঁর মা তাকে আশ্বস্ত করেছে- "সেংজা দেবতা তোর জন্ম দিয়েছে টোটোদের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য... সেংজার বরপুত্র তুই" এবং কমলালেবুর গাছ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যখন তো তারা বাঁশের চাষ শুরু করেছিল তারপর একসময় বাঁশ উজার হয়ে যায় তখনও ধানুয়ার দিদিমা ও মায়ের মুখে শোনা যায় যে প্রকৃতির দান হিসেবে যা পাওয়া যাচ্ছে তার কেনাবেচা দেবতা সহ্য করেননি – "সেংজা তাদের লোভের শাস্তি দিয়েছে। ... প্রকৃতি দেবতার দানে তুষ্ট না হয়ে কেনা বেচা আর লাভের লোভে যখন আরও বেশি বেশি বাঁশ ফলানোর জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠলো সেংজার তা ভালো লাগেনি।" এবং অবশেষে হরেকৃষ্ণ বাবুর রাজনৈতিক পার্টি যখন পাকা রাস্তা পাকা সেতু করার প্রতিশ্রুতির বন্যা তৈরি করেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ধানুয়া দৃপ্ত কণ্ঠে জানায় -

> "এই প্রকৃতি হল আমাদের ইশ্বর, আমাদের সেংজা। সেই সেংজাকে আমরা ধ্বংস করব আর সরকারি বাবুদের কৃপায় পাওয়া তহবিল দিয়ে বছরে একবার সেংজা পুজোর জাঁকজমক করলে আমাদের ধর্ম রক্ষা হবে কি? হবে না।"[১০]

যে মাতৃরূপা 'সেংজা'- জঙ্গল, নদী, পাহাড় টোটোদের লালন পালন করেছে, সেই অরণ্য ধ্বংস করে সরকারি তহবিলের দাক্ষিণ্যে বাঁচার কোন অর্থ হয় না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা'র অভিজিতের সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বরকে -"ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না।"[১১] টোটো জীবনের সাথে নিবিড় বন্ধনে বাঁধা আছেন 'সেংজা'। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এ ভাবেই উপন্যাসে প্রদর্শিত হয়েছে।

> "টোটোপাড়ায় রাতের অন্ধকার আর নৈ:শব্দ যখন এমন ঘন জমাট হয়ে ওঠে... মৃত পূর্বপুরুষদের চোখ, হিসপা আর পুদুয়া পাহাড় যেন একে অপরের দিকে ঝুকে পড়ে আলিঙ্গন করে, তখন মায়ের শরীরের ওমের মধ্যে গুটিয়ে শুয়ে ধানুয়ার ভালো লাগে মায়ের মুখে পুরনো দিনের গল্প শুনতে।"[১২]

'হিসপা' ও 'পুদুয়া' - পাহাড় সম্পর্কে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলেও 'বাইফোকালিজম' অনলাইন পত্রিকায় জয়ন্ত কুমার মল্লিকের লেখনীতে 'ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জলদাপাড়া' শীর্ষক রচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন –

> "টোটোরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর ইশপা যিনি ভুটানের বাদু পাহাড়ে থাকেন তিনি অসুন্তুষ্ট হলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে টোটোরা তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য শূকর, ছাগল, পায়রার মত প্রাণী বলি দেয় এবং 'ইউ' পান করে।"[১৩]

'হিসপা' ও 'ইশপা' - দেবতার নামের মধ্যে ধ্বনিগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকায় তাদের একই দেবতা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

টোটো জনজাতির বিশেষ পুজো হিসেবে 'বিবরৌ' পুজো ও দেমসায় পুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বিবরৌ' পুজো হল বাৎসরিক শিব পুজো। রাভা পুরোহিত বিশাল বট গাছের তলায় এই পুজো করতেন। সাধারণত চৈত্র মাসের শেষে এই পুজো করা হত। বিবরৌ পুজো শিবলিঙ্গে করা হত, এখানে মহিলাদের যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

এছাড়াও দেমসা প্রান্তরে যে বাৎসরিক পুজো হয় তারও বর্ণনা পাই উপন্যাসে। গোটা টোটো সমাজ এই পুজোয় একত্র হতো। ধানুয়ার ছোটবেলায় এই পুজো চলত দুই তিন দিন ধরে। টোটো পাড়ার সব গ্রাম থেকে টোটোরা টানা দুই তিন দিন দেমসার কাছে অস্থায়ী ঘর তুলে থাকতো। উপন্যাসের বর্ণনায় পাওয়া যায় তারা সঙ্গে নিয়ে আসতো ইউ আর কাইন শাকসবজি। সকলে মিলে পূজোর আনন্দে মশকুল হয়ে নাচ গানে বিভোর হতো। এই পুজোর পোশাক হিসেবে একটি বিশেষ পোশাকের সন্ধান পাওয়া যায়, যা টোটো জনজাতির 'পরম্পরাগত আদি পোশাক' -

> "এই পোশাক হল লম্বা একখণ্ড সাদা বস্ত্র। কোমরে এক পাক বেঁধে বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ের পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে এনে বাঁধতে হয়। কত না বছর আগে জানোয়ার দিদিমা যখন যুবতী ছিল তখন এই বস্ত্র সে ঘরে বুনে ছিল। তখন টোটোদের ঘরে ঘরে এভাবে গাছ-গাছরা থেকে পাওয়া উপাদান থেকে সুতো তৈরি করে বস্ত্র বোনার কৌশল জানা ছিল। সেই জ্ঞান এখন হারিয়ে গেছে।"[১৪]

এছাড়াও, ধানুয়া এবং চম্পাকলির বিবাহ প্রসঙ্গে দেখা যায় ধুমধাম করে বিয়ের বাড়িতে সানাই, ঢোল, মাদল, বাজিয়ে গ্রামের লোকেদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে দুই দিন বিবাহ উৎসব পালন করা হয়। এই ভাবেই, লোককথা, সামাজিক রীতি, লৌকিক পূজা পার্বণ, আর ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ করে একটি জনজাতিকে। অথচ বর্তমানে যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমাগত এই ঐতিহ্যের ক্ষয় যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে লেখককে।

চার

'ধানুয়ার কথকতা' - পরিচ্ছেদে দেখতে পাই টোটোদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী গল্প আকারে ব্যক্ত হয়েছে ধানুয়ার মুখে। এই গল্প, এই লোককথা কোন এক দিনে বা একজনের সৃষ্টি নয়, বংশ পরম্পরায় চলে আসা এসব কাহিনী টোটো সমাজের লোক ঐতিহ্যের দলিল। বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের পূর্বপুরুষরা এক সময় পাহাড়ে বাস করতেন। সেই সব পাহাড়ের শত শত বছর আগে টোটোদের পূর্বপুরুষরা জন্মেছিলেন। তারপর তারা সমতলের দিকে চলে আসেন কাউন চাষ ও শিকার করতে। শেষে ঘন জঙ্গল পেরিয়ে সলসলবাড়ি নামক জায়গায় ডেরা বাঁধলেন। বড় কঠিন ছিল তাঁদের জীবনযাত্রা, তখন মূলত শিকারই তাদের খাদ্য সংগ্রহের প্রধান উপায় হওয়াতে শিকার পাওয়া না গেলে সমস্যায় পড়তে হতো। আবার বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে হত্যা করা পশুকে তাঁরা নিম্নলিখিত উপায়ে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন -

> "তারা সে আওয়াজ লক্ষ্য করে বিষ মাখা তির ছুড়ল। ভোরের আলো ফুটলে মাচা থেকে নেমে শিকার হওয়ার জন্তু থেকে যে যার মত মাংস ভাগ করে রাখল। জন্তুর মাথা মোড়লের ভাগে। আর একভাগ পুরোহিতের জন্য।"[১৫]

এই পশু শিকারেও তাঁদের বিশেষত্ব ছিল। বর্ণনা অনুযায়ী সম্বর বা নীলগাই তারা হত্যা করলেও গরু জাতীয় মিথুন বা বাইসন হত্যা তাঁরা করতেন না। এই শিকার যাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গে টোটোদের একটি প্রচলিত বিশ্বাস বা ধারণা সম্পর্কেও জানা যায়, শিকার যাত্রার আগে দলের পুরোহিত মোরগ বলি দিতেন। সেই কাটা মুন্ডু যে দিক নির্দেশ করত সেই দিকে যাওয়াই স্থির হত। তবুও ধানুয়া যে গল্প বলে চলে তাতে বোঝা যায় যে সব সময় এই রীতি ফলপ্রসূ নাও হতে পারে, কারণ গল্পের ঘটনা অনুযায়ী দিকনির্দেশ সত্বেও উত্তরে শিকার জোটেনি তাদের। এর পাশাপাশি ওয়াঙদি টোটোর অনুরোধে চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশব্যাক এর মত টোটো জাতির ইতিহাস ধ্বনিত হয় ধানুয়ার কণ্ঠে। ১৮০০ শতকের প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বের ঘটনা বলে যায় সে। 'জেদে'- তে (সাতি নদীর তীরে একটি জায়গার নাম) বসতি গড়ার পর টোটো জাতি ডয়া জাতির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের শেষে যারা বেঁচে ছিল তারা জেঞ্চু/জেদে ছেড়ে পশ্চিম দক্ষিণে যাত্রা করতে থাকে। ধানুয়ারা যে জায়গায় থাকতো সেখানেই গুয়াটি বলে এক ঝোরার পাশে বৌদুবি গোষ্ঠী

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 454-462
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাড়া স্থাপন করেছিল যার বর্তমান নাম ধুমসি গাঁও। নিতেন ঝোরার পাশে যে পাড়া স্থাপন করা হয় তার বর্তমান নাম পুজা গাঁও। এছাড়াও নুডরিং, মাত্রবি, নুবেবি - ইত্যাদি অনেক গোষ্ঠী মিলে প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে পাড়া গঠন করে -

> "দাতেনতি নদী পেরিয়ে টোটোদের পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে দানকবি দাঙত্রবি, নুবেবি গোষ্ঠী জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে, বর্তমানে তার নাম পঞ্চায়েত পাড়া।"[১৬]

এভাবেই ধানুয়া ইতিহাসের সাথে বর্তমানের সেতু গঠন করে টোটোপাড়ার ইতিহাস জানিয়ে পাঠককে সমৃদ্ধ করেছে।

পাঁচ

এই উপন্যাসে বেশ কিছু টোটো শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন, যেমন- টুংচা হওয়া। উপন্যাসের মূল চরিত্র ধানুয়া, তার দিদিমার কাছে শুনেছে দিদিমারা যখন ছোট ছিলেন তখন টোটোরা ৭৮ জনের দল বেঁধে পুরুষ মহিলা মিলে প্রায় কুড়ি ত্রিশ দিনের জন্য জঙ্গল সংগ্রহের লম্বা অভিযানে বেরোতেন। একে টুংচা হওয়া বলে।

জাপেন - বাঙালি, বিহারী, নেপালি যারা টোটো পাড়ার বাইরে থেকে এসেছে তাদের জাপেন বলা হয়।
লিনও - বাইসন বা মিথুন
টোটো কাইজি - প্রধান পুরোহিত
বড়েদি - জংলি লতা
গাপ্পু - সমাজ প্রধান
ইউ - জারানো মারুয়া জাতীয় খাদ্যদ্রব্য।
আসরফি - সোনার মুদ্রার নাম (১ আসরফি = ২০ টাকা চাঁদি)
চিগাইসু আর মুগাইসু - দেমসার চালায় পুরুষ আর নারী ঢোলক যেখানে ঝোলানো থাকে।

টোটো ভাষায় বিভিন্ন প্রকার বাঁশ নিম্নরূপ -

স্যাপা বাঁশ - নরম ও ফাঁপা বাঁশকে বলা হয় স্যাপা বাঁশ। এর কচি অংশ খেতে, এছাড়াও বেড়া বাধঁতে, ঝুড়ি বুনতে ব্যবহৃত হয়।
দেংপা বাঁশ - স্যাপার তুলনায় শক্ত বাঁশের নাম দেংপা। মূলত ঘর তৈরিতে এই বাসের ব্যবহার হত।
অ্যাপা বাঁশ - লালচে রঙের বাঁশের নাম অ্যাপা। এটি দিয়ে টোটোরা জলের পাত্র তৈরি করতেন।
বুরুপা বাঁশ - লালচে লম্বা গাঁটওয়ালা বাঁশ হলো বুরুপা বাঁশ।

ছয়

উপন্যাসের চলমান গতিপ্রবাহে টোটো জনজাতির আবির্ভাব, জীবনযাত্রা, পূজা-পার্বণ, সামাজিক রীতি-নীতি, লোক বিশ্বাস, লোকপ্রথার সাথে পরিচিত হতে গিয়েই উপলব্ধি করা যায়- কি ভীষণ জীবন সংগ্রাম তাঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল। টোটোদের নিয়মিত ভাবে জমি হারানোর ঘটনার কথা শোনা যায় ধানুয়ার মায়ের মুখে। নুবে বা তোরসার পারের সব ধানী জমি দখল করে নেয় জাপেনরা–

> "হাতি চড়ে এসে জাপেনরা টোটোদের জমির ফসল ঘর সব পুড়িয়ে দিল। সেই ১৯৬৮ সালে।"[১৭]

এভাবেই আইনি-বেআইনি পথে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল মানুষগুলোকে। এছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অবস্থা হয় আরো শোচনীয়। খরার সময় টোটোপাড়ার জঙ্গল আর পুদুয়া পাহাড় থেকে জংলি কন্দ আর শাক সংগ্রহ করে চলে প্রাণ ধরে রাখার চেষ্টা। সরকার থেকে সাহায্য করা হলেও সব টোটো পরিবার সাহায্য পায় না এবং –

> "টোটো যুবক যুবতীরা এবার কাজের খোঁজে ভুটান পাড়ি দিতে শুরু করল। কমলা লেবুর বাগানের কাজ, জঙ্গল কেটে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরীর কাজ, বিদ্যুতের খুটি আর লাইন টানার কাজ। অনাদরে অবহেলায় তাদের কতজন মারা গেল দুর্ঘটনায় - বরফ জমা শীতে জমে, পাহাড়ের ধ্বসে চাপা পড়ে, বা বিদ্যুতের ভয়ংকর ছোবলে।"[১৮]

এরপর চলে বর্ষায় বন্যা –

> "হাওড়ির প্লাবন টোটোপাড়াকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বাইরের জগত থেকে।"[১৯]

জঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহের উপায় না থাকায় অনেকে বাড়ির পোষা শুয়োর, মুরগিকে জবাই করতে থাকে। তাও সময় ফুরোয়, রাতের শেষে সূর্যোদয় হবেই - আর অদম্য জীবনীশক্তি নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলে টোটোসমাজ।

টোটোদের এই জীবন সংগ্রামের সাথে পরিচয়ের পাশাপাশি আরেকটি সমস্যার সামনে ঔপন্যাসিক পাঠকদের দাঁড় করান, তা হল - মাতৃভাষার ক্ষয়। 'ইস্কুল' পরিচ্ছেদে দেখেছি টোটো ভাষা না বোঝার কারণে বড় মাস্টার যেমন টোটোদের পড়াশোনা শেখাতে পারেননি তেমনি ধানুয়ারাও মাস্টারের ভাষা না বোঝার কারণে পড়াশোনা শিখতে পারেনি। পরবর্তীকালে ধানুয়া কোচবিহারের পঞ্চকন্যা গ্রামের এক মিশনারী স্কুলে পড়াশোনা করেছে। বাংলা, সাদরি, কামতাপুরী ভাষাও সে রপ্ত করেছে। স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করার পর স্কুলের শিক্ষকরা তাকে ফালাকাটায় ফৌজের চাকরিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করার কথা বললেও –

> "সে শুধু টোটো পাড়ার পাহাড় জঙ্গল নদীতে ফিরে আসতে চায়, আপনজনদের সঙ্গে টোটো ভাষায় কথা বলতে চায়।"[২০]

অথচ পরবর্তীকালে সেই লক্ষ্য করেছে কিভাবে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হরেকৃষ্ণ বাবুর পার্টি প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। টোটো ভাষাকে একপ্রকার শুধুমাত্র 'বাবুদের বেঁধে দেওয়া মঞ্চে নাচ-গান- নাটক' করার ভাষার গণ্ডিতে বেঁধে ফেলার যন্ত্রণা ধানুয়া মানতে পারেনি। টোটো ভাষার অবলুপ্তি ঘটলে টোটো শিশুরা পূর্বপুরুষদের কথা উপলব্ধি করতে পারবে না, তাঁদের স্বপ্ন বেঁচে থাকার লড়াই, বেঁচে থাকার ইতিহাস আগামী প্রজন্ম হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার ভাবনায় বিদ্ধ হয়ে ধানুয়া ভেবেছে- সেগুলো শেখার প্রয়োজন যদি আর না বোধ করা হয় তবে নিজেদের আর বাপ ঠাকুরদার পরিচয় টোটো বলে জাহির করা কেন? ধানুয়া টোটো অনুভব করেছে কি প্রচন্ড দিন সামনে এগিয়ে আসছে বহুকাল পরে সেই লক্ষ্য করে তার এই আশঙ্কা ধীরে ধীরে ফলশ্রুতির রূপ পাচ্ছে। দেমসায় পুজো প্রাঙ্গণে তরুণ টোটোদের নিজেদের সংস্কৃতি ভাষার প্রতি যেন আগ্রহ কমে যাচ্ছে ঔপন্যাসিকের ভাষায় -

> "আজকাল পুজোয় নাচ গান হলেও তাতে সেই প্রাণের টান মেলে না, সব যেন আনুষ্ঠানিকতায় ভরা। সেই দিনের গানগুলো এখন একজন দুজন ছাড়া কেউ গাইতে পারেনা, সে সব গানের ভাষাও আজকের তরুণ টোটো দের কাছে অনেকটাই অজানা হয়ে গেছে। সেসব গানের বেশিরভাগ টোটো শব্দের মানে আজকে তরুণ টোটোরা জানে না।"[২১]

অথবা আনমনা ধানুয়া কখনো বলেছে –

> "অনেকে তো এখন টোটো পরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছে রে দাদু, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা কোনটাই তাদের পছন্দ হচ্ছে না বাবু সাজতে চাইছে তারা।"[২২]

টোটো জনজাতীয় বর্তমান নগর সভ্যতার আগ্রাসন থেকে নিজেকে দূরে সরাতে পারে না। বিশাল ইমারত আর শেখানো কথার আড়ালে বুঝি হারিয়ে যেতে চায় প্রকৃতিপ্রেমী টোটোদের মুখের ভাষা, তার সংস্কৃতি। এই প্রাণ শক্তির ক্ষয়, এই মাতৃভাষার ক্ষয় - ধানুয়ার মনকে বিষাদ ভারাক্রান্ত করে তোলে।

সাত

পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত ধনীরাম টোটোর ব্যক্তিজীবনের চেতনা-মনন দিয়ে তৈরি করেছেন 'ধানুয়া' চরিত্রটিকে। Wikipedia- এর তথ্য অনুযায়ী টোটো ভাষার আলাদা শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ থাকলেও নিজস্ব লিপি বা হরফ ছিল না তাই বাংলা লিপিতে লেখা যেত এই ভাষা। পরবর্তীকালে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ভাষাবিদ টোবি আন্ডারসনের সাহায্যে দীর্ঘ

দশ বছরের চেষ্টায় সৃষ্টি করেন টোটো ভাষার সম্পূর্ণ বর্ণমালা যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। উপন্যাসের ধানুয়া না পারলেও উপন্যাসিক নিজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই টোটো ভাষাকে এবং সম্মান অর্জন করেছেন। ধানুয়া টোটো এভাবেই হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের মানসপুত্র। শৈশব থেকে সংগ্রাম, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর সে সাক্ষী থাকে মাতৃভাষার অবক্ষয়ের রূপ দেখার। অরণ্য দেবতা অর্থাৎ 'সেংজা' - এর ওপর আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই কি সে হল্লাপাড়া বিট অফিস আর তিতি বন বাংলোয় আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়? এর সদুত্তর উপন্যাসে নেই। এর উত্তর সন্ধানের ভার পাঠকের ওপরই ন্যস্ত হয় -

> "জঙ্গল পাহাড়ের ধ্বংস ডেকে আনা সভ্যতার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের জানান দিতেই কি জঙ্গলে মিশে যাওয়ার আগে সে ওই সভ্যতার দুটো প্রতীককে পুড়িয়ে দিয়ে গেল?"[২৩]

উপন্যাসটি রচনার পশ্চাতে পরিশিষ্ট অংশে সম্পাদকের লেখনীতে ফুটে ওঠে এ কাজের পিছনে ঔপন্যাসিকের নিষ্ঠা - টোটো জাতির ইতিহাস, জীবনযাত্রাকে বিশদে বোঝানোর জন্য লেখক তাঁকে –

> "কখনো তিনি লঙ্কা পাড়ার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমাকে হাঁটাপথে ঘুরিয়েছেন, ডয়ামারা গুহায় নিয়ে গেছেন...নদী ঝোরাকে দেখিয়েছেন, চিনিয়েছেন।"[২৪]

আর সে কারণেই উপন্যাস পাঠে টোটোপাড়ার অরণ্যে হারিয়ে যেতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। এভাবেই 'ধানুয়া টোটোর কথামালা' শেষ হয়, কিন্তু 'ধানুয়া' তার অস্তিত্বের ছাপ রেখে যায় পাঠকের হৃদয় জুড়ে। বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য, সামাজিক রীতি, পুজো-পার্বণ, লোককথা, টোটো শব্দ ও ডয়ামারা গুহা- প্রকৃতই হয়ে উঠেছে টোটো জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দর্পণ।

Reference :

১. টোটো, ধনীরাম. *ধানুয়া টোটোর কথামালা,* প্রথম সংস্করণ।১২৫, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা, ৭০০০৪৭, অন্যতর পাঠ ও চর্চা, নভেম্বর, ২০২১, পৃ. ৭২

২. মল্লিক, কুমার জয়ন্ত, *ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জলদাপাড় বাইফোকালিজম,* ২রা ডিসেম্বর, ২০২২, http://http://https://www.bifocalism.com/history-and-culture-of-toto-tribes-in-india-jayanta-kumar-mallick/

৩. ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পাদক), *সুধীপ্রধান স্মারক গ্রন্থ,* ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা ৭৩, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ২৭৫

৪. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৫. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৬. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৩

৭. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৮. রায়, ধনঞ্জয়, *উত্তরবঙ্গের লোকজীবনচর্যা,* ৩৭/১১ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৯, ভোলানাথ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, পৌষ-১৩৬২, পৃ. ১

৯. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

১০. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মুক্তধারা,* ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড কলকাতা ১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ভাদ্র, ১৪১৮, পৃ.২৯

১২. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১৩. পূর্বোক্ত,

http://https://www.bifocalism.com/history-and-culture-of-toto-tribes-in-india-jayanta-kumar-mallick/
১৪. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫
১৫. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
১৬. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
১৭. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
১৮. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
১৯. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
২০. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
২১. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
২২. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
২৩. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
২৪. আকরগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

Bibliography :

আকরগ্রন্থ :

টোটো, ধনীরাম. *ধানুয়া টোটোর কথামালা,* প্রথম সংস্করণ, ১২৫, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা – ৭০০০৪৭, অন্যতর পাঠ ও চর্চা, নভেম্বর, ২০২১